একাত্তরের আহত দুব্‌লা

আমি যখন প্রথম সৌদিতে আসি তখন কোরিয়ানদের সাথে কাজ করতে গিয়ে ইংরেজী উচ্চারনে তথা ভাষাগত কিছু সমস্যা হয়েছিল। তবে ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানীদের সাথে তেমন কোন সমস্যা হয়নি। যদিও তখন শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রয়োজনের বাইরে কারো সাথে তেমন কোন কথা বলতাম না। নতুন হিসাবে কিছুটা জড়তাও ছিল। প্রসঙ্গক্রমে একদিন হঠাৎ করেই দেখলাম আমার সেই জড়তা নিমিষেই উবে গেল।

পাকিস্তানী এক সেলস্‌ম্যান জহির ভাই আমাদের কোম্পানীতে আসতো। ডিলিং হত আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে। সেই হিসাবে তার সাথে আমার কথা হত। শুধু মিষ্টভাষী সেল্‌সম্যান বলে নয়, আসলেই সে অত্যন্ত ভাল মানুষ। খুব মায়া দিয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলতো। প্রথমদিন আমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর হ্যান্ডসেক করল এবং নবাগত হিসাবে বুকে বুক মেলাল। তারপর কুশলাদী জিজ্ঞাসা করল এবং প্রবাস জীবন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ধারনা দিল। যেন সহজেই পরিবার চ্যুত মনটাকে বশ করে রাখতে পারি। যাইহোক, সে যতই আন্তরিকতা দেখাক না কেন, আমি কিন্তু তাকে সহজভাবে গ্রহন করতে পারিনি। কারণ সে পাকিস্তানী। তাকে দেখলেই যুদ্ধের কাহিনী মনে হত। অবশ্যই আমাদের শত্রু পক্ষ মনে হত, যেন পাকিস্তানী বলতেই আমাদের শত্রু। কত অত্যাচারই না করেছে এদেশে! সেই বায়ান্ন থেকে শুরু করে একাত্তর সাল পর্যন্ত। সেই ইতিহাস কম বেশী সবাই জানে। নির্দয়ভাবে এদেশের বুদ্ধিজীবিদের স্ত্রী সন্তানের সামনে থেকে ধরে নিয়ে, বাবা মায়ের সামনে টেনে নিয়ে হত্যা করেছে, নির্দোষ জনসাধারনের উপর ধুলিঝড়ের মত গুলিবর্ষন করেছে, স্বামীর সামনে স্ত্রীর ইজ্জত লুন্ঠন করেছে, সন্তানের সামনে মাকে বিবস্ত্র করেছে, ভাইয়ের সামনে বোনকে ধর্ষন করেছে, বোনের সামনে ভাইকে বিবস্ত্র করে বেওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে, মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছোট্ট শিশুটিকে খোঁচা দিয়ে বেওনেটের আগায় তুলে ছরকীর মতো ঘুরিয়ে দুরে ছুড়ে ফেলেছে (একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে শুনেছি)। জহির ভাইকে দেখলেই আমার সেইসব বিভৎসতার কাহিনী মনে হত। শরীরের রোম জেগে উঠত। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যেত। শরীর শিরশির করে উত্তপ্ত হয়ে টগবগ করে উঠল। ধমনী নেচে উঠল। মাথা দিয়ে আগুন বের হতো। বুকের ভেতরে ধুকধুকানী বেড়ে যেত। ভেতরটা ঘৃনা বা অনীহায় ভরে যেত। মনটা প্রতিবাদী হয়ে উঠত। ঠিক সহ্য করতে পারতাম না। ইতিহাস থেকে জেনেছি, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে শুনেছি, প্রত্যক্ষদর্শী আত্মীয় স্বজনের কাছে শুনেছি, আবার সিনেমায়ও দেখেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের বর্বরতা, নৃশংসতা ও নির্মম অত্যাচারের কাহিনী। তাতেই শরীর শিয়রে উঠে। ফলে আপন মাটির টানে মাটির শরীর প্রতিবাদী হয়ে লাফিয়ে উঠে। সন্দেহ থাকার কথা নয়, হয়ত তেমনি প্রতিবাদী হয়ে দেশের বীর সন্তানেরা জীবনের মায়া কাফনে মুড়িয়ে রেখে সেদিন মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এবং সেই মাতৃহন্তা হানাদার, রাজাকার, আল-বদর, আল-সামস স্বাপদকুলের কুকৃতিকে পরাজিত করে ছিনিয়ে এনেছে লালসবুজ পতাকা।

মনকে বুঝাতে গিয়েও সান্তনা পাইনি। বিষয়টা শেয়ার করলাম আমার এক কলিগ কিবরিয়ার সাথে। সে পুরানো প্রবাসী। কিবরিয়া জহির ভাইর সাথে বেশ মজা করতো এবং অন্তরঙ্গ ভাবও ছিল। সেই সুবাধে মজার ছলে আমিও একদিন চা-চক্রে তাদের সাথে যোগ দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললাম। উদ্দেশ্য, তাকে লজ্জা দেওয়া নয়। তার সাথে ভালমন্দ আলাপ করা, মতামত জানা এবং নিজেকে কিছুটা হাল্কা করার চেষ্টা মাত্র। বিশ্বাস করা কঠিন হবে হয়তো- প্রসঙ্গ তোলা মাত্রই জহির ভাই মাথা নীচু করে ফেললেন। উর্দুতে বললেন, (যার অর্থ হল) লজ্জা দিও না ভাই, ওকথা বলে আমাদের আর লজ্জা দিওনা। আমরা লজ্জিত। সত্যিই আমরা ভাবতে পারিনা যে, আমাদের তৎকালীন সামরিক শাসক এতো জঘন্য ছিল। যারা মানুষ হয়েও হিংস্র জানোয়ারের মত অত্যাচার করেছে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান ভুখন্ডে বসবাসকারী জনসাধারনের উপর। জাত-ধর্ম-বর্ন-গোত্র সব কিছুকে আলাদা করে দেখলে মানুষের প্রথম পরিচয় সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব 'আশরাফুল মাখলুকাত'। তারপর হয়ত রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু মুসলমান হয়েও সেদেশের মুসলমানের উপর তারা সীমাহীন অত্যাচার করেছে। হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছে। বাড়ী-ঘর সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারখার করে দিয়েছে। হিন্দুদের জিন্দা আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে।

ম্যাচের কাঠিটা কার হাতে ছিল, জানো ? অত্যাচারী সেনাদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-সামস'সহ আরো বেশ কয়েকটি বাহিনী। যাদের সহায়তায় তোমাদের দেশের মানুষকে কীট পতঙ্গের মত পিসিয়ে পিসিয়ে যাচ্ছেতাই করে মেরেছে। আমরা সবই জানি। মেয়েদের ধরে নিয়ে হিংস্র পশুর মত ছিড়েভিড়ে ভোগ করেছে। পাকিস্তানী সেনারা তো তোমাদের দেশের পথঘাট চিনতো না, লোকজন চিনতো না, মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা চিনতো না। কে তাদের চিনিয়েছে? কে তাদের সহযোগিতা করেছে ? অত্যাচারের মুল সহযোগী কারা ? মনুষ্যরুপী কিছু জানোয়ার। যারা নিজেদের বড় মাপের মুসলমান হিসাবে দাবী করে। আসলে তারা মুসলমানের গন্ডী ছেড়ে বেরিয়ে গেছে একাত্তরেই। তারাই হয়ত সেই আইয়ামে জাহেলিয়ার সেই অত্যাচারী কাফেরদের অবশিষ্ট বংশধর। তাদের উস্কানীতেই অত্যাচারের মাত্রা ছিল অসীম। তারা নিজেরা যেমন ভোগ করেছে, তেমনি ভোগ করিয়েছে। দোষ পড়েছে একক ভাবে পাকিস্তানী সেনাদের উপর। খোদা নিশ্চয়ই ওদের বিচার করবে। অথচ জনসমাজে এখন বাঁচার জন্যে ধর্ম ভিত্তিক ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। যদি তা নাই হবে তবে দেখিয়ে দিক, কোরাণ বা হাদিস তথা ইসলামের কোথায় লেখা আছে যে, যারা ন্যায়ের পথে থেকে বাঁচার জন্য স্বাধীনতার চায় বা দেশের ভুখন্ড বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে তাদের ধরে ধরে হত্যা কর, তাদের বংশ ধ্বংস কর, তাদের সম্পদ লুটে নাও, জ্বালিয়ে দাও, ঘরের মেয়েদের ধরে নিয়ে শত্রুদের হাতে ভোগ্যবস্তু হিসাবে উপহার দাও, ছেলে যুদ্ধে যাওয়ার অপরাধে মাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ছেড়ে দাও, নিস্পাপ শিশুদের হত্যা কর, তাদের মুখের খাবার কেড়ে নাও, মাতৃস্তন কর্তন করে ফুটবলের মত উষ্ঠা মেরে পদদলিত কর, মুক্তিকামী হওয়ার অপরাধে মসজিদের ঘাটে অযুরত অবস্থায় গুলি করে মারো (নাউজুবিল্লাহ)। বরং ইসলামের আদেশ হল- দেশকে রক্ষা করার জন্যে, ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে শত্রু বিরুদ্ধে জিহাদ করো। সেই জিহাদে যাদের মৃত্যু হবে তাদের রক্তবিন্দু এতো পবিত্র যে, শরীর থেকে মাটিতে পড়ার আগেই খোদার দরবারে সম্মানীয় আসন প্রস্তত হয়ে যাবে (সোবহানাল্লাহ)। অথচ তারা করেছে উল্টোটা। তাহলে ভেবে দেখো, তারা কিসের মুসলমান ? কিভাবে নিজেকে ইসলাম বা মুসলমান রক্ষাকারী হিসাবে আখ্যা দেয়? হ্যা সুযোগ আছে, পুনরায় ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করতে হলে তাদেরকে একাত্তরের অপকর্মের জন্য তওবা-তিল্লা কেটে পাকসাফ হয়ে প্রবেশ করতে হবে। আর সেই তওবা তিল্লা পাকসাফ মানেই হল বিচার, দেশদ্রোহীর সুষ্ঠু বিচার। রাষ্ট্র তাদের বিচার করবে এবং জনগন যদি তাদের মাপ করে দেয়, তবেই হবে পাকসাফ।

নিস্প্রভ হয়ে শুধু শুনেই গেলাম জহির ভাইয়ের কথা। কিছু বলার কোন জায়গা পাইনি। ভাষাও ক্ষয়ে বসেছি। বেশ কিছু সময় ধরে আমাদের মাঝে করুন বিউগনের সুর বেজেছিল। ফ্রীজ হয়ে বসে ছিলাম। দেখলাম তার চোখের কোণে মুক্তার দানার মত অনুশোচনার জল চিকচিক করছে। কে অন্যায়কারী, আর কে অনুশোচনাকারী ? তারা এখনও আমাদেরকে মানুষ হিসাবে অভিন্ন মনে করে। এটা সত্য যে, প্রবাসী হওয়ার পর গত আট-নয় বছরে কোন পাকিস্তানীর মুখে বাংলাদেশীদের নিয়ে কোন প্রকার সমালোচনা, অবহেলা বা হেয় প্রতিপন্নতা শুনিনি বা দেখিনি। দেখেছি ইন্ডিয়ানদের মাঝে, অহরহ এবং প্রতিদিন দেখে আসছি। অথচ তাদের নিয়ে আমি কী ভেবেছি অথবা আমরা কী ভাবছি ? জানার বা বোঝার প্রয়োজন আছে। হয়ত একেই বলে মনুষ্যত্ব বা বিবেক। পাকিস্তানী জনগনের সাথে এদেশের জনগনের কখনো কোন বিরোধ ছিলনা বা নেই। ছিল রাজনৈতিক বিরোধ (স্বাধীনতা- ১৯৭১ এবং ভাষাগত বিরোধ- ১৯৫২)।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবো, কিন্তু বিষয়বস্তু খুঁজে পাইনি। আমাদের তিনজনের অন্তরেই তখন কান্নার শীতল প্রবাহ বয়ে গেল। অথচ বাস্তব কোন দৃশ্য নয়, বরং সংলাপ শুনেই অমন স্তব্ধতা। বাস্তবতা তাহলে কত নির্মম হতে পারে। কল্পনা করা কঠিন। যদিও সেই কল্পনাকে একাত্তরে বাস্তবে রুপ দিয়েছিল রাজাকার, আল-বদর, আল-সামস, শান্তিবাহিনী, নক্সাল বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর জালেমরা। যাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি শিশু থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেউই। মা-মুরগীর সামনে থেকে যদি তার বাচ্চাকে শিয়ালে নিয়ে যায় তবে মা-মুরগীটা নিজের জীবন বিপন্ন করে বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্যে উড়ে গিয়ে শিয়ালকে ঠোকর মারে। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি লাগে তাতে কোন সমস্যা হয়না, কিন্তু ভাইকে যদি অন্য কেউ মারে তখন অন্য ভাই শত্রু হলেও ছুটে গিয়ে তার প্রতিশোধ নেয়- কেন তার ভাইকে মেরেছে? বোনের সামনে যদি তার ভাইকে অন্য কোন মেয়ে সামান্যতম টিজ করে তবে বোন ছুটে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারতে দ্বিধা করে না। ভাইয়ের সামনে তার বোনকে দেখে যদি কোন বখাটে শিশ দেয়, তবে ভাই ছুটে গিয়ে তার পেটে চাকু বসিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। ছেলের সামনে বাবাকে বাঘে কামড়ে ধরে নিয়ে গেলে ছেলে বাঘের সাথে যুদ্ধ করতে পিছপা হয় না। একেই বলে সম্পর্ক। আত্মার

সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক হার মেনেছিল ঐ রাজাকার দেশদ্রোহীদের নৃশংসতার কাছে। তাদের চরম নিষ্ঠুরতার কাছে তুচ্ছ ছিল সেই পবিত্র ও শক্তিশালী আত্মার সম্পর্ক।

স্বাপদ কুলের সেই অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়ে সেই যে হিন্দু সম্প্রদায় এদেশ ছেড়ে যেতে শুরু করেছে আজো তারা যাচ্ছে। পুরানো রাজাকারদের আস্কারা পেয়ে নুতন করে পয়দা হচ্ছে নব্যরাজাকার। যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করে তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য করছে এবং অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নিচ্ছে। বর্তমানে ওপার বাংলায় রয়েছে অনেক জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ যারা লেখক, কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, রাজনীতিবিদ তথা বুদ্ধিজীবি হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। যাদের জন্ম হয়েছিল এই মাটিতে। অথচ আজ তাদেরকে আমরা অতিথি হিসাবে সম্বোর্ধনা দেই। একাত্তরে সেই দেশদ্রোহীদের কৃতকর্মের ফলেই জম্মসুত্রে বাংলাদেশী হয়েও পার্সপোর্ট নিয়ে এদেশে তাদের প্রবেশ করতে হচ্ছে ভারতীয় হিসাবে। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। মাটির টানে সাড়া জাগে প্রাণে। সেই টানেই তারা মাঝে মাঝে তাদের পুর্বপুরুষের ভিটেয় এসে জম্মভুমির মাটিতে হাঁটু গেড়ে মাটি কপালে তুলে কাঁদে। এ যে কত কষ্টের, তা হয়ত তারাই বুঝতে পারে যারা বঞ্চিত বা বিতাড়িত। প্রবাসী হলে অবশ্য তাদের কষ্ট কিছুটা অনুভব করা যায়। যতই আমরা অভিমান করি না কেন, প্রবাসে না এলে দেশের মর্ম বুঝা যায় না।

জহির ভাইয়ের আরেক সহকারী হলেন মাজাহার ভাই। তিনিও পাকিস্তানী নাগরিক। একদম মাটির মানুষ। সত্যিই, এতো ভাল মানুষ খুব কম দেখা যায়। তবে তিনি খুব দুখী। পরিবার নিয়ে সৌদিতে থাকেন। স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন। তবে নিঃসন্তান। এটাই তার দুঃখ। সেই দুঃখের মাঝে (বেশ কিছু দিন পর) একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে একই বিষয় নিয়ে মন্তব্য জানতে চাইলাম। তিনিও জহির ভাইয়ের মত একই ধরনের কথা বললেন এবং এক পর্যায়ে সহজ সরল মানুষটা উত্তেজিত হয়ে হানাদারদের সহযোগী সেই কুখ্যাত রাজাকার আল-বদর বাহিনীর মনুষ্যরুপী জানোয়ারদের বিচার এবং কঠিন শাস্তি কামনা করেছেন। সেই হিংস্রতায় শাস্তি কামনা করেছেন যেমন হিংস্রতা দেখিয়েছিল তারা একাত্তরে বাংলা মায়ের বুকের উপর দাঁড়িয়ে। অন্যথায় (তার মতে) তৎকালীন সেই পুর্ব-পাকিস্তানের তথা বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের ভুখন্ডে একাত্তরের সেই বর্বর অমানুষদের অত্যাচারে আহত হওয়া একটি দুব্লাও সতেজ হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। বরং তাদের অভিশাপের বোঝা বহন করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজম্মসহ সমস্ত জাতিকে। আর তার জন্যে দায়ী থাকবে এদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, যারা এখনো জেগে ঘুমিয়ে আছে এবং সেই স্বাপদচক্রের বিচার করতে গরিমসি করছে। বাংলা নববর্ষে (১৪১৫) আমরা সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে একটি সুস্থ্য স্বাধীন রাজাকারমুক্ত তথা দেশদ্রোহীমুক্ত এবং সহনশীন দ্রব্যমূল্যসহ একটি শান্তিময় বাংলাদেশ দেখতে পাবো এই প্রত্যাশাই করছি।

আইয়ুব আহমেদ দুলাল

সৌদি আবর।

E-mail:- ayubahmedd@gmail.com

ayubalibd@hotmail.com

তাং ০৫.০৫.০৮ইং